

ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে মার্কিন সৈনিকের প্রতিবাদী বক্তব্য

| [Admin](#)



আমার নাম মাইক প্রাইসনার। আমি যখন আর্মিতে জয়েন করলাম তখন

আমার বয়স আঠার, সময়টা ২০০১ সালের জুন মাস। ২০০৩ এর মার্চ মাসে আমাকে ১৭৩তম এয়ারবোর্ন ব্রিগেড এর হয়ে উত্তর ইরাকে যুদ্ধে যোগ দিতে হয়েছিল, এর আগে আমি ১০ম মাউন্টেন ডিভিশন এ যুক্ত ছিলাম।

হুম, আসলে...প্রথম যখন আমি সেনাবাহিনীতে যোগ দিলাম, আমাদেরকে শুরুতেই একটি কথা বলা হয়েছিল, আর তা হল... মিলিটারিতে বর্ণবাদ,জাতিবিদ্বেষ ইত্যাদির কোন অস্তিত্ব নেই। বৈষম্য, অসমতা ইত্যাদি অহমিকা যেন আচমকা কেউ এসে উড়িয়ে নিয়ে গেল, এরকম একটা অনুষ্ঠানও হয়েছিল যার নাম ছিল ‘Equal Opportunity Program’। আর এজন্য আমাদের বাধ্যতামূলক ক্লাসে অংশ গ্রহণ করতে হল, এমনকি প্রতিটি ইউনিটের থেকে একজন EO প্রতিনিধি নিযুক্ত ছিলেন, তার কাজ ছিল এটা নিশ্চিত করা যে, বর্ণবাদ জাতীয় কোন ঝামেলা যেন কেউ সৃষ্টি না করে, যত সামান্য পরিমাণেই হোক না কেন। বর্ণবাদ,জাতিবিদ্বেষ ইত্যাদির কোন আলামত পেলেই, তা জন্মের তরে মিটিয়ে দেয়ার জন্যে আমেরিকান আর্মিকে বেশ নিবেদিত প্রাণ বলেই মনে হল। ...এরপর সেপ্টেম্বর ১১ এর ঘটনা ঘটল, এরপর আমি কিছু নতুন নতুন শব্দ শুনতে লাগলাম, ...‘টাওয়েল হেড’, (মুসলিমদের মাথার পাগড়িকে ব্যংগ করে), ‘উটের জকি’ ...এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিরক্তিকর ছিল... ‘বালুর নিগ্রো’ আর অবাক করা বিষয় হল এই শব্দগুলো আমি আমার সহকর্মী কিংবা সাধারণ কোন সৈনিকদের মুখ থেকে শুনছিলাম না, এগুলো শুনতে পাচ্ছিলাম সিনিয়র অফিসারদের মুখ থেকে, আমার প্লাটুন সার্জেন্ট, কোম্পানির ফার্স্ট সার্জেন্ট কিংবা ব্যাটালিয়ন কমান্ডারদের কাছ থেকে। (যে মিলিটারী এতদিন বর্ণবাদের নাম গন্ধ পর্যন্ত নির্মূলের ব্যবস্থা নিয়েছিল) হঠাত তাদের মধ্যে চেইন অব কমান্ডের সকল শাখায়, উপর থেকে নিচ পর্যন্ত এই মারাত্মক (মুসলিম)জাতি বিদ্বেষী ও হিংসুক বর্ণবাদী শব্দগুলো চালু হয়ে গেল, এবং সবাই এটাকে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মেনে নিল !

এবং আমি আরও দেখলাম, সবচেয়ে মারাত্মক বিদ্বেষপূর্ণ বর্ণবাদী লোকজন ছিল যারা প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল আর এই শব্দগুলো তারা প্রয়োগ করতো সাধারণ সিভিলিয়ান যানবাহন পুড়িয়ে দেয়ার সময়। এই শব্দগুলো নতুন কিছু ছিলনা, বরং এইগুলো তারা আগেও ব্যবহার করতো যখন এই(আমেরিকান) সরকার যেকোন ধরণের টার্গেটেড কিলিং এর বৈধতা জন্ম দিল, এর মধ্যে ছিল সাধারণ জনগণ সিভিলিয়ানদের ঘর-বসত বাড়ি, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, এমনকি তারা এও জানত যে এর ফলে শত হাজার শিশু হত্যাকাণ্ডের শিকার হবে, মারা পড়বে। ঐ শব্দগুলো ছিল সেই শব্দ যেগুলো আমেরিকান জনগণব্যবহার করেছে যখন তারা তাদের সরকারকে অনুমোদন দিল

যে

ইরাক যুদ্ধের জন্য তারা যত খুশি অর্থ ব্যয় করবে। আর এটা এমন একটা ব্যাপার, যেটা অনেকেই আজকে ভুলে গেছে। কিন্তু, আমরা তা কিছুতেই ভুলতে পারি না।

আমরা এতদিনে নিশ্চয়ই জেনে গেছি যে, আগ্রাসনের শুরু থেকে এ পর্যন্ত আমরা এক মিলিয়ন(দশ লাখ) এরও বেশি ইরাকি জনগণকে হত্যা করেছি। কিন্তু, এরও আগে ৯০ দশকের শুরুর দিকে নানা অবরোধ ও বোমা বর্ষণের মাধ্যমে আমরা আরও এক মিলিয়ন জনগণকে খুন করেছি। কিন্তু, বাস্তবে এই সংখ্যা আরও বেশি।

২০০৩ সালে যখন আমি ইরাক গেলাম, আমিও তখন একটা নতুন শব্দ শিখলাম, আর শব্দটা ছিল ‘হাজি’ ! (বলা হত) “‘হাজি’ আমাদের শব্দ’, “‘হাজি’ আমাদের শব্দ’ ! ‘হাজি’ মানে প্রত্যেক ইরাকি। সে কোন একক ব্যক্তি নয়, কোন পিতা নয়, কোন শিক্ষক নয়, নয় কোন কর্মী, শ্রমিক। আর এই শব্দ, এই বিষয়টির আলাদা একটি গুরুত্ব অবশ্যই আছে, এই শব্দটা আমরা বারবার আমাদের কানে শুনেছি শীতকালীন সৈনিক(ট্রেনিং) এর সময়ে, কিন্তু আজকে আমাদেরকে বুঝতে হবে...এই শব্দটা কোথা থেকে আসল..

মুসলিমদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর একটি হল ...ধর্মীয় সফরে মক্কা যাওয়া। আর এটাকে বলা হয়...হজ্জ। আর যে এটা করে তাকে বলা হয় হাজি। আর এটা ইসলামের ঐতিহ্যগত একটি বিষয় যা কিনা তাদের ধর্মের সর্বোচ্চ একটি ইবাদত। আর দেখুন, আমাদের অবস্থা ! আমরা মুসলিমদের সর্বোচ্চ, শ্রেষ্ঠ বিষয়টাকে নিয়ে নিলাম আর এমনভাবে শব্দটা ব্যবহার করতে লাগলাম যেন এটা একটি নিচু পর্যায়ের খারাপ, বাজে শব্দ।



কিন্তু, ইতিহাস আমাদের মাধ্যমে শুরু হয়নি, এই ইতিহাস শুরু হয়েছে এই দেশ(আমেরিকা)এর জন্মের মাধ্যমে। দেশটির জন্ম থেকেই বর্ণবাদ, জাতিবিদ্বেষের উস্কানির (কখনো আদিবাসী আমেরিকান বিদ্বেষ, কখনো জাপানি এশিয়ান বিদ্বেষ, ভিয়েতনাম কিংবা কিউবা আর আজকে মুসলিম বিদ্বেষ) মাধ্যমে বার বার চেষ্টা করা হয়েছে অগ্রাসন, দখলদারিত্ব আর যুলুম অত্যাচারকে বৈধতা দেয়ার। যারা বুড়ো ভিয়েতনাম ফেরত তারা নিশ্চয়ই জানেন, সে সময়...একগাদা নতুন শব্দ জন্ম নিল...যেন এর মাধ্যমে সেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে বৈধ হালাল প্রমাণ করা যায়। আর, আমি যেকথা বলছিলাম, (এরকম অনেকগুলো শব্দের মধ্যে) হাজি’ ছিল একটা শব্দ যা আমরা বার বার প্রয়োগ করছিলাম,

আমি যে নির্দিষ্ট মিশনে গিয়েছিলাম, যার কথা আপনাদের বলতে যাচ্ছি,

সেখানে এই শব্দটা খুব বেশি বলা হচ্ছিল, মানুষের বাড়ির দরজার গিয়ে লাথি মারা, তাদের ঘরবাড়ি তহনছ করা, নানা রকম অভিযান ইত্যাদির গল্প আমরা অনেক শুনেছি। কিন্তু, আমার মিশনটা ছিল কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। যার কোন ব্যাখ্যা আমি পাইনি, কেন আমাদেরকে এগুলো করতে আদেশ করা হয়েছিল। আমাদের বলা হল, এই কয়েকটি বাড়ি, পাঁচ কিংবা ছয়টি বাড়ি এগুলো এখন আমেরিকান মিলিটারির

সম্পত্তি, আর এখন আমাদের সোজা ওখানে যেতে হবে আর বাড়ির লোকদেরকে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করতে হবে।

আর আমরা সেখানে গেলাম, পরিবারগুলো জানিয়ে দিলাম যে তোমাদের ঘরবাড়ি এখন আর তোমাদের নেই ! তাদেরকে আমরা কোন বিকল্প সুযোগ দিলাম না, কোন অর্থ সাহায্য বা ক্ষতিপূরণ, কোন বিকল্প থাকার স্থান কিছুর না! একই সাথে তারা খুবই ভয় পেল , এবং কি করবে তা বুঝতে পারছিল না। তারা বাড়ি ছাড়ছিল না, তাই আমরা ওদেরকে জোর করে বের করে দিলাম। একটি পরিবার, যার কথা আমার আজকে বিশেষভাবে মনে পড়ছে, একজন মহিলা, সাথে দুটি কমবয়সী মেয়ে বাচ্চা, একজন খুব খুখুড়ে বয়স্ক লোক, তাদের সাথে আরও দুজন মাঝ বয়সী লোক, আমরা তাদেরকে টেনে হিঁচড়ে এনে বাড়ি থেকে বের করে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেললাম। শুধু তাই নয়, আমরা পুরুষ লোকগুলোকে গ্রেফতার করলাম বাড়ি ছাড়তে রাজি না হওয়ার অপরাধে। আহ, সেই একেবারে খুখুড়ে বুড়ো লোকটাও আটকা পড়ল, আর তাদেরকে আমরা জেলখানায় বন্দী করলাম। আর সেই সময়, আমি আর জানি না, সেই লোকদের কি পরিণতি হয়েছিল, জানি না, যখন আমরা তাদের হাতগুলো মাথার পিছনে নিয়ে বেঁধে দিলাম, এরপর একটা বালির বস্তা দিয়ে মুখ মাখা ঢেকে দিলাম।

দুর্ভাগ্যের কথা, কয়েক মাস পর, আমাকে (এরকম একজনকে) খুঁজে বের করতে হল। আমরা ছিলাম সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসাবাদের দায়িত্বে, আমাকে জেরা করার কাজে পাঠানো হল, একশরও বেশি ঘটনার সাক্ষী আমি, শতাধিক জিজ্ঞাসাবাদ আমি দেখেছি, একটি ঘটনা যা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি, সেই একটি মুহুর্তে যেন আমার সামনে সব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল, এই দখলদারি, আগ্রাসনের আসল চেহারা যেন ছিল সেটিই। সেই বন্দীটি...যাকে জেরা করার দায়িত্বে আমি ছিলাম, আমি গিয়ে দেখি, তার কাপড় চোপড় ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে, শুধুমাত্র একটি নেংটি পরে আছে সে, হাত মাথার পিছনে নিয়ে বাঁধা। তার মাথা একটা বালির বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। হায়, আমি কোনদিন সেই লোকটির মুখ দেখতে পাইনি, আমার কাজ ছিল তার মেটাল ফোল্ডিং চেয়ার নিয়ে সজোরে দেয়ালে আছড়ে মারা, যেখানে দেয়ালের দিকে তার মুখ ঠেসে ধরেছিল অন্য আরেক সৈন্য, সে সৈন্য বারবার কেবল একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে চলছিল, আর আমার কাজ ছিল তাকে ভয় দেখানোর জন্যে তার দেয়ালে ঠেসে ধরা মাথার পাশে বার বার সজোরে মেটালের চেয়ারকে আছড়ে ফেলা। সে কি উত্তর দিচ্ছিল তা শোনার দিকে কারও কোন মনোযোগ নেই, আমার কাজ শুধু তার ঠেসে ধরা মাথার পাশে চেয়ার দিয়ে আঘাত করে চলা।

আমরা এই কাজটি করতে লাগলাম, একসময় আমরা নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। আমার নতুন কাজ ঠিক হল, বন্দীটিকে দেয়ালের বিপরীতে যেভাবেই হোক দাঁড় করিয়ে রাখা, যত বেশি সময় সম্ভব, আমি তাকে পাহারা দিচ্ছিলাম, আমাকে নিশ্চিত করতে হবে সে যেন দাঁড়িয়েই থাকে।কিন্তু, আমি খেয়াল করে দেখলাম, লোকটার পায়ে কি যেন একটা সমস্যা আছে, সে আহত,, কিছুতেই সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। বারবার সে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। যে সার্জেন্ট ইন চার্জ ছিলেন, তিনি বার বার এসে আমাকে জানিয়ে গেলেন, লোকটাকে তার নিজের পায়ে দাঁড়া করিয়ে রাখতে হবে, আর তাই আমি বার বার তাকে টেনে তুলছিলাম, দেয়ালে ঠেসে ধরছিলাম, ছেড়ে দেয়ার সাথে সাথে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল, আর প্রতিবারই নতুন করে আমাকে তাকে দাঁড় করিয়ে দিতে হচ্ছিল। আমার সার্জেন্ট আবার এলেন, আর তিনি আমার উপরে ভীষণ খেপে উঠলেন, তিনি জানতে চাইলেন কেন আমি তাকে অনবরত দাঁড় করিয়ে রাখতে পারছি না? তিনি বন্দী লোকটিকে টেনে তুললেন, কয়েকবার সর্বশক্তি দিয়ে ধরে দেয়ালে আছড়ে দিলেন, যখন সার্জেন্ট চলে গেল, আমি নিচে তাকিয়ে দেখি বালুর বস্তায় মুখ আটকানো লোকটার বস্তাটি রক্তে লাল হয়ে গেছে। এরপর আমি তাকে বসতে দিলাম, কিছু সময় পর হঠাৎ খেয়াল করলাম আমার সার্জেন্ট আবার উপস্থিত। এরপর আমি আবার বন্দীটিকে উঠে দাঁড়াতে বললাম, আগের মত সার্জেন্টের আদেশ পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, ... হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম ..আমি আসলে কি করছি... .আমার মূল কাজ তো ছিল এই বন্দীর বিরুদ্ধে ইউনিটের পক্ষ থেকে নজরদারি করা, আর আমি কিনা বন্দীর পক্ষ হয়ে ইউনিটকেই নজরদারি করছিলাম !

আর এতসবের মধ্যেও আমি চেষ্টা করলাম, আমার পেশা ও দায়িত্ব নিয়ে গর্বিত হওয়ার জন্য, কিন্তু যে অনুভূতি বার বার আমাকে আক্রান্ত করল...তা শুধুই লজ্জা, ...আর আজ জাতিবিদ্বেষ-বর্ণবাদ(টেররিস্ট, সন্ত্রাসবাদ, জংগীবাদ) ইত্যাদি দিয়েও আর কোনভাবে এই দখলদারিকে মুখোশ পড়িয়ে আড়াল করা যাচ্ছে না। ওখানেও লোকজন ছিল, ওখানেও মানব সন্তানেরা বসবাস করছে। সেই তখন থেকে আমাকে অপরাধবোধ তাড়া করে চলেছে, যখনই আমি কোন বয়স্ক মুরুব্বীকে দেখি তখন আমার মনে পড়ে এরকম কত বয়স্ক লোক ছিল, যারা হাঁটতে পারত না, স্ট্রেচারে ভর করে চলত, আর আমরা তাদের তুলে দিয়েছি ইরাকি পুলিশের হাতে। আমার নিজেকে দোষী মনে হয় যখনই আমি কোন মা কে দেখি, সাথে তাঁর সন্তানদের নিয়ে পাগলের মত বিলাপ করছেন, কাঁদছেন...তখন আমার মনে হয় আমরা আসলে সাদ্‌ম হোসেনের চেয়েও খারাপ কাজ করেছি...আমরা তাদেরকে উদ্বাস্ত গৃহহীন করে ছেড়েছি। আমার নিজেকে দোষী মনে হয়, যখন আমি কোন কিশোরী মেয়েকে দেখি, আমার মনে পড়ে এরকম কতজনকে আমরা হাতে ধরে টেনে এনে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলেছি।

আমাদেরকে একথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হত যে, আমরা জংগী-সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। কিন্তু সত্যিকারের সন্ত্রাসী ছিলাম আমি, আর সত্যিকারের সন্ত্রাস জংগীবাদ হল এই দখলদারিত্ব। মিলিটারি বাহিনীতে জাতিবিদ্বেষ-বর্ণবাদের উস্কানির মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে অন্যায় ধ্বংসযজ্ঞ, অন্যের দেশ দখল করাকে হালাল প্রমাণ করার চেষ্টা চলে আসছে। এটা এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রের মত। দীর্ঘদিন ধরে এই যন্ত্রটি ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যায় হত্যাকাণ্ড, বন্দীত্ব, মানুষের উপর টর্চার করাকে বৈধ প্রমাণ করা হচ্ছে। জাতিবিদ্বেষ হচ্ছে এই সরকারের ছড়িয়ে দেয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। এই অস্ত্রটি রাইফেল, ট্যাংক, বোমারু বিমান কিংবা যুদ্ধ জাহাজের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর এর ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা আর্টিলারি শেলের চেয়েও বেশি, বাংকার বিধ্বংসী বোমা কিংবা টমাহক মিসাইল এর চেয়েও। এই অস্ত্রগুলো যারা তৈরি করেছে, নিজেদের মালিকানায় রেখেছে তারা আমাদের সরকার, কিন্তু এই সরকার কিংবা অস্ত্র, বোমার কোন কিছু করারক্ষমতা নেই যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ স্বেচ্ছায় এগুলো ব্যবহার করবে।

যেই লোকগুলো আমাদেরকে যুদ্ধে পাঠিয়েছে মানুষ হত্যা করার জন্যে, তাদেরকে কখনো বন্দুকের ট্রিগার চাপতে হয়না, কিংবা মর্টারের গোলা ছুঁড়তে হয়না। তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করতে হয় না। তাদেরকে শুধু যুদ্ধকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে বিক্রি করতে হয়। একারণে, তাদের এমন কিছু জনগণ থাকা চাই, যারা তাদের নিজেদের সৈনিকদের ক্ষতির পথে ঠেলে দিতে প্রস্তুত, আর তাদের এমন সৈনিকদেরও প্রয়োজন যারা কোনপ্রশ্ন করা ছাড়াই হত্যা করতে রাজি, কিংবা নিজেরাও মরতে রাজি। তারা মিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে পারে কোন একটা বোমা তৈরির পিছনে, কিন্তু সেই বোমাটি কেবল তখনই একটি মারণাস্ত্র হিসেবে কাজ করবে যখন সৈনিকদের মানসিকতা এরকম থাকে যে, আমরা সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছি, এখন কি আদেশ করার করো ! তারা তাদের শেষ সৈনিকটিকেও পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে পাঠাতে প্রস্তুত। কিন্তু যুদ্ধ কেবল তখনই শুরু হতে পারে, যখন মারামারি করার মত মানসিকতা নিয়ে সৈনিকরা তৈরি থাকে; আর সমাজের সুবিধাভোগী শাসক শ্রেণী (এমপি, মন্ত্রী, আমলা, সিনেটর ইত্যাদি) বিত্তশালী বিলিয়নিয়ার যারা মানুষের দুর্দশার উপর লাভ করে সম্পদ বানিয়ে নেয়, তাদের চিন্তা হচ্ছে কেবল নিজেদের সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করা নিয়ে, কিভাবে বিশ্বের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, আপনার বুঝার চেষ্টা করুন,

তাদের ক্ষমতা হচ্ছে এটাই যে তারা আমাদেরকে রাজি করিয়ে ফেলেছে

আমাদেরকে তারা ঘোল খাওয়াতে সক্ষম হয়েছে এভাবে যে, যুদ্ধ,যুলুম আর বঞ্চনা করা হচ্ছে আমাদের নিজেদের স্বার্থে।

তারা একথা ভাল করেই বুঝে যে, তাদের সম্পদ উপার্জন নির্ভর করে সাধারণ মানুষকে ঘোল খাইয়ে নিজেদের স্বার্থে লাগানোর উপর, কর্মজীবী মানুষকে ফুসলিয়ে রাজি করানো, অন্য দেশের মার্কেটকে নিয়ন্ত্রণের কাজে দরকার হলে তোমরা মরতে রাজি থাকো। অন্য একটি দেশের সাধারণ মানুষ হত্যার জন্যে কিংবা নিজেদের মৃত্যুর জন্যে তারা আমাদের উদ্বুদ্ধ করছে, রাজি করাচ্ছে এই বুলি দিয়ে যে, আমরাই

হলাম শ্রেষ্ঠ জাত। সৈনিক, নাবিক, মেরিন কিংবা বিমানসেনা আমাদের এই দখলদারি থেকে কিছুই অর্জন করার নেই।

আমেরিকায় বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষের জীবনেই এই দখলদারি যুদ্ধ কোন লাভ বয়ে আনবে না। বরং এর কারণে আমাদের জীবনে ভোগান্তি-দুঃখ কষ্টই কেবল বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা আমাদের হাত পা হারিয়েছি, অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করছি, আর আমাদের জীবনও হারাচ্ছি। আমাদের পরিবারকে আজ এই দৃশ্য দেখতে হচ্ছে যে, জাতীয় পতাকায় মোড়ানো কফিনে তাদের স্বজনদের দেহ সমাহিত করা হচ্ছে। মিলিয়ন মানুষ এদেশে স্বাস্থ্যসেবার বাইরে, কর্মহীন বেকার, কিংবা শিক্ষার সুযোগের বাইরে, অথচ এই সুবিধাবঞ্চিত লোকগুলো দেখছে কিভাবে তাদের আমেরিকান সরকার দৈনিক ৪৫০ মিলিয়ন অর্থ ব্যয় করে যাচ্ছে এই দখলদারী, আগ্রাসনের পিছনে। একদেশের গরীব-কর্মজীবী মানুষকে পাঠানো হচ্ছে অন্য আরেকটি দেশের গরীব-কর্মজীবী মানুষকে হত্যা করার জন্যে। আর এতে ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে, হায় আজকে যদি এই (মুসলিম)জাতিবিদ্বেষের কারণে (আমাদের আমেরিকান)সৈনিকেরা অন্ধ না হয়ে যেত, তাহলে তারা দেখতে পেত ইরাকের সাধারণ লোকদের সাথেই আমাদের জীবনের অনেক বিষয়ে মিল রয়েছে। অথচ যে বিলিয়নিয়ার আমেরিকানরা আমাদের যুদ্ধে পাঠাচ্ছে তাদের সাথে আমাদের জীবনে অমিল আর পার্থক্যই বেশি।

আমি ইরাকে কত পরিবারকে টেনে হিঁচড়ে রাস্তায় এনে ছুঁড়ে ফেলেছি, তাদেরকে আমি ঘর বাড়ি হারা করেছি, অথচ আমি নিজে চেয়েছি মিশন শেষ করে কবে ঘরে ফিরব ! একটি দেশের পরিবারকে ধ্বংস করে আমি নিজে স্বপ্ন দেখেছি নিজের একটি ঘর বাঁধার, সত্যিই মর্মান্তিক, ট্রাজিক অপ্রয়োজনীয় এই ছুঁড়শা সৃষ্টি করা। আমরা যদি জেগে উঠি, বুঝার চেষ্টা করি তাহলে দেখতে পাব, আমাদের সত্যিকারের শত্রু তারা নয়, যারা হয়তো আজ অনেক দূরের কোন দেশে বাস করছে। কিংবা তারাও নয়, যাদের নাম পর্যন্ত আমরা কেউ জানি না, কিংবা যাদের সংস্কৃতি (মুসলিম জীবনচারণ) আমাদের বুঝে আসে না।

আমাদের আসল শত্রু এমন সব লোকেরাই যাদের আমরা সনাক্ত করতে সক্ষম, আর খুব ভালো করেই চিনি। আজ আমাদের শত্রু হচ্ছে এই সিস্টেম (তাগুতি মানব রচিত জীবন বিধান), যা যুদ্ধ শুরু করে দেয় যখন দেখে এখানে লাভ করার সুযোগ আছে। শত্রু হচ্ছে সেই প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ যারা আমাদেরকে চাকরি হতে ছাঁটাই করে, যখন তারা বুঝতে পারে তাদের লাভ উঠে এসেছে। আরো আছে ইনস্যুরেন্স কোম্পানিগুলো যারা আমাদের স্বাস্থ্যসেবা দিতে অস্বীকৃতি জানায় অথচ নিজেদের লাভ উঠিয়ে নেয়, শত্রু হচ্ছে এই ব্যাংকিং ব্যবস্থা যারা (সুদভিত্তিক ঋণ দিয়ে এরপর) আমাদের বাড়ি ঘর ছিনিয়ে নেয়, আর নিজেদের লাভ বুঝে নেয়। আমাদের শত্রুরা ৫০০০ মাইল দূরের কেউ নয়, তারা এখানেই আছে, আমাদের নিজেদের ভূমিতে। আমরা যদি নিজেদের একত্রিত করি, সংগঠিত করি, আমাদের ভাই ও বোনদের সাথে কাজ করি, আমরা এই অন্যায় যুদ্ধগুলোকে বন্ধ করতে পারি, আমরা এই সরকারব্যবস্থাকে থামাতে পারি, আর পারি একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলতে।

